# গল্পমালা

মলয় দাশগুপ্ত



এক নম্বর গল্পটার আগে সামান্য একটু গৌর চন্দ্রিকা দরকার।

কলকাতা শহরে এমন কিছু ক্লাব আর হোটেল আছে যেখানে ইচ্ছে থাকলেও সকলের প্রবেশাধিকার নেই। পকেটে রেস্ত থাকার ব্যাপারটাতো আছে, কিন্তু সেটাই শেষকথা নয়। প্রে - ডিগ্নি নামক একটি ইংরাজি শব্দকেও অনুসরণ করা হয়। একময় ওই পে - ডিগ্নি শব্দটিকে বিলিতি কুকুরের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে দেখে আমার বিলক্ষণ বোধোদয় হয়েছিল যে শব্দটি কুকুরদের মর্যাদা সম্পর্কিতই। এখন দেখি মনুষ্য প্রজাতির পরিচয় বোঝাতেও এই একই শব্দ ব্যবহৃত হয়। সে যা হোক এ রকম মনুষ্য সমাগম নিয়ন্ত্রিত একটি ক্লাবে কখনো তাদের যে বয় নামেও ডাকা হয় এ তথ্যও ওর বেয়ারা বয়ই আমাকে দিয়েছে। আমার সেই বন্ধুর মুখে শোনা এ গল্পটি। এরসত্যাসত্য বিষয়ে আমার বলার কিছু নেই, একটি কথাই আমি বলতে পারি, আমি ওই বন্ধুকে বিশ্বাস করি।

বন্ধুর নাম চঞ্চল কই। কই পদবীটি আমাদের পরিচিত নয়, অথচ চঞ্চল বাংলা স্কুলে পড়া, বাংলাভাষী। অক্ষরিক অর্থেই ওর মাতৃভাষা বাংলা। ওর নাম নিয়ে স্কুল জীবনে ওকে অনেক হ্যাপা পোয়াতে হয়েছে, সে মাস্টার মশাই থেকে সহপাঠী বন্ধুরা -- কেউ ওরনাম পদবী নিয়ে না খেপিয়ে ছাড়েনি। খেপাতে চাইলেও খেপেনি, চঞ্চলের চরিত্রর বাঁধন এমনই ছিল, বাঁধন না বলে গড়ন বললেই বোধ হয় ভাল শোনায়। আমার একটু ঔৎসুক্য ছিল তাই জানতে পেরেছি ওরা বাবার বাবা চীনে কোন একটু আধা শহর থেকে ভাগ্য ফেরাবার উদ্দেশ্যে ঘুরতে ঘুরতে কলকাতায় এসেছিলেন। ওর ঠাকুমাও ছিলেন স্বামীর সঙ্গেই। তবে চঞ্চলের বাবার জন্ম এ দেশে, চীনে যাওয়ার সুযোগ হয়ে ওঠেনি, হিন্দি - চিনি ভাইভাই যুগে ওর বাবা তো নেহাত বালক, তারপর ও দেশ মুখো হওয়ার কথাই ওঠে না। চঞ্চলের মা বাঙালী, একেবারে ভেতো বাঙালীই। বাবার পদবী কই, স্বাভাবিক ভাবে চঞ্চল কই। তবে ক উচচারণটা অর্ধ স্বরের এবং আমাদের আ-বর্ণ - ঘেঁষা।

গল্পটা চঞ্চলকে নিয়ে নয়, চঞ্চলের মুখে শোনা, এ গল্পে চঞ্চল উদ্দিষ্ট নয় চঞ্চল অবলম্বনমাত্র। ওর মুখেই শোনা যাক মিস না মিসেস এ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। ক্লাবে যারা আসেন তাদের সঙ্গে আমার চেনা বাইরের দুনিয়ার মিল নেই। কে কোন ঘর থেকেএল বা কোন বংশের তা জানতে চাওয়ার অর্থ চাকরিটি নট। আমাদের চাকরি ট্রেনিং প্রিয়ডে পইপই করে একটা কথা খুব জোর দিয়ে শেখানো হয়েছিল, মেম্বারদের পার্সোনাল লাইফ, প্রাইভেট জীবন নিয়ে কোনো উৎসাহ দেখাবে না। ইউ আর ওয়েটার্স য়ু শুড ওয়েট টিল দে কল য়ু, য়ু আর টু মাইন্ডইওর জব। বি জেন্টল, সফ্ট স্পোকেন এ্যাণ্ড ডিউটিফুল, নাথিং মোর।

কৌতূহল দেখালে তোমার চলবেনা। আদতে এ সব ক্লাব যেমন সারা দিনের কাজের পরে একটু বিশ্রামের জায়গা তেমন আবার কাজ হাসিলের জায়গাও। আমরা দেখে যাই, কিন্তু জানতে চাইনা। ফলে তিনি মিস না মিসেস তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা ওঠে না। তবু একটা কথা তোমায় বলি, আচার আচরণে সোহাগ সম্ভোগে মিস বা মিসেস ফারাক করা যায় না এখানে। বরং ম্যাডাম বলাই ভাল, কী বললে? ম্যাডোনা, ইচ্ছে হলে ও নামও দিতে পারো।

তিনি ক্লাবের নিয়মিত আসতেন। নিয়মিত মানে রোজ না, সপ্তাহে চার-পাঁচ দিন ধরতে পারো। ওঁর একটা বিশেষ টেব্‌ল্ ছিল, এসে সেখানে বসতেন। কখনো একা কখনও সঙ্গে অন্য কেউ --- অন্যরা বেশির ভাগই পুষ এবং হাই - ফাই পুষ।

পুষদের হাই - ফাই বললাম বলে আমাদের ম্যাডামও খুব ফেলনা ছিলেন না, ডিগ্‌নিফাইড্‌ মহিলা। ক্লাবে তো কম বড় বড় লোক আসে না, তারা রীতিমত নড করে কথা বলে ওঁর সঙ্গে। বেশি খেতেন না, খুব বেশি রাত অবধি থাকতেন না, মেপে ড্রিঙ্ক করতেন। এ সব লক্ষ করা আমাদের জব - কোডের বাইরে নয় বলেই বলতে পারছি। তবে, তোমরা যারা ওই দুনিয়ার বাইরে থেকে মনে কর যে হৈ হুল্লোর আর মদো মাতালি করার জন্য ওখানে ওরা যায় তারা অন্ধের হাতি দেখার মতই দেখো। ক্লাবটাও ওদের কাজের জায়গা, কারবারের জায়গা।

প্রথম প্রথম তিনি আমাকে ডাকতেন না। পরে একটি ঘটনা ঘটল, হঠাৎ আমার দিকে চোখ পড়ায় ওঁর চোখ স হলো, ইশ ারায় কাছে ডাকলেন। আমাদের বুকের ওপর আমাদের নাম লেখা থাকে, খুব কাছে চোখ এনে নামটা পড়লেন। ওর শরীর থেকে পারফিউমের গন্ধ আমার মাথা ঘুরিয়ে দেয়। এয়ার কণ্ডিশন ঘরেও আমার ঘাম হয়, চেয়ে থাকতে পারিনা -- এত দামি, এক সুন্দরীর এত কাছে, একেবারে নিশ্বাসের মধ্যে এর আগে আসিনি। হুঁশ ফিরে পেয়ে বলি, ইয়েস ম্যাডাম।

আমার চেহারা না আমার নাম কোনটা তার ভাল লেগেছিল, পছন্দ হয়েছিল জানিনা। এরপর থেকে যেদিন তিনি অ াসতেন সেদিনই উঠে যাবার সময় হাজার টাকার একটা নোট আমাকে দিয়ে যেতেন। সে তার সঙ্গে কেউ থাকুক বা না থ াকুক। আমি তো ভয়ে কাঁপতুম, জব-কোড মানার ভয়, ওই মেয়ের রূপ আর টাকার জ্বালায় জ্বলবার ভয়। তোমাকে লুকবো না --- আমার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে --- নিজেকে যতটা সম্ভব সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার দিকে মন যায়। আর একটা অনুচিত কাজ করে ফেলি--- ওই ম্যাডামের সম্পর্কে জানার কৌতূহল কিছুতেই রোধ করতে পারিনা।

ম্যাডাম আসে, আগের মতই বন্ধুরাও থাকে। আমার কাজ আমি করি, ওদের কাজ ওরা, ক্লাবের রেয়াজ ভাঙি না। যাবার সময় কখনও টুক্কি দিয়ে কখনও হাতের ঈশারায় আমায় ডেকে হাজার টাকার নোট ধরিয়ে যায়, কেবল আমাকে দেয় অ ার কারোকে না। আমি টাকাটা ফেরত দিতে পারি না, টিপ্‌স্‌ ভেবে অন্যদের জানাতেও পারি না, অথচ কেমন একটা ভয় আমাকে চেপে ধরতে থাকে। যত হাজার টাকা তত ভারি হয়ে জমাট বাঁধতে থাকে ভয়। ওই মহিলার আমি কিছু জানিনা, কে কোত্থেকে আসে, কী করে সেসব আমার জানার কথাও নয় প্রয়োজনও নেই।

অথচ একটু টোকা মারতেই জানতে পারি সব কিছু। আমাদের ক্লাবের অন্য ওয়েটাররা দেখি চুপকে চুপকে অনেক কথাই জানে। খুব এ্যারিস্টোক্র্যাট ফ্যামিলির মেয়ে, বড় বিজনেসম্যানের বউ, নিজে হেন কাজ নেই যা না করেছে। কলেজে পড়িয়েছে, বিজ্ঞাপনের মডেল হয়েছে, বাংলা সিনেমায় চুটিয়ে অভিনয় করেছে। দেশের বাইরে গেছে, বিদেশ থেকে যারা আসেন -- তা ক্রিকেট খেলোয়াড়ইহোন আর ডেলিগেশন মেম্বার হোন ওঁর সঙ্গে থাকে বাঁধা। হাজার টাকা তো ওর চুলের খুস্‌কি, ঝাড়লেই পড়ে যাবে --- এরকম নানা কিসিমের খবর পেয়ে যাই আমি। যত এসব শুনি তত দমে যাই। হাজ ার টাকার ভার তত অসহ্য হয়। মিথ্যে বলব না, একটা দিন ও না এলে মন হাল্কা হয় বটে আবার পরক্ষণেই একটা মন কেমন করা ভাব আজকাল করে--- বুঝতে পারি মাকড়সার জালে পড়া মাছি হয়েগেছি, নিস্তার নেই।

ওঁর সঙ্গে দু'চারটে কথা যে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু সেসবই বিজনেস - ওয়ার্ড, তার বাইরের কিছু না। ক্লাবে বাংলা বলা, বিশেষত কর্মচারীদের বাংলা বলা নিষিদ্ধই বলতে পারো। বলে যাওয়ার মত ইংরাজি বলা শিখে নিতে হয়েছে আমাদের। দু' চারটে হিন্দি শব্দ বা শব্দের মিশেল চললেও চলতে পারে বাংলা একেবারেই চলে না। কারণ আমাদের ক্লাবের যাঁরা সদস্য, যাঁরা এখানে আসেন -- তাঁরা বা তাঁদের সঙ্গে আসা গেস্টরা সবাই ইংরাজি বলেন, মাঝে মধ্যে হিন্দি। ফলে ইংরা জি বলাটা আমাদের রপ্ত করতেই হয়েছে। যে দেশে যে আচার তা তো মানতেই হবে।

আমার ওই মিসেসও ইংরাজি ছাড়া একটি শব্দ উচচারণ করতেন না চোস্ত ইংলিশ। ও যখন টাকার নোটটা আমায় দিত, আমার মুখ তখন ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যেত, তবু 'থ্যাঙ্কয়ু ম্যাডাম' বলতে ভুলতাম না। ম্যাডামও হেসে আমার দিকে না তা কিয়ে ক্লাব ছাড়নতেন না। বলব কী ওই হাসি আমাকে আরো অবশ করে দিত, হাসির মধ্যে কী যাদু যে থাকত, সে চোখের ভাষায় গা ছমছম করা আলো, আমি সে আলোতে জ্বলে যেতাম। তিনি গাড়িতে ওঠা অবধি তার দিকে তাকিয়ে থাকত াম। মাকড়সা মাছিটাকে আরো আঠা মাখাচ্ছে,কাছে টানছে, বুঝতাম কিছু করার ছিল না। অথচ বাইরে থেকে অন্য কেউ কিছু বুঝতেই পারত না, কঠোর নিয়মের একটুও এদিক ওদিক হতে পারেনি।

এই ভাবে দিনের পর দিন চলার পরে অবশেষে সেই দিনটা আসে, ম্যাডাম অন্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি রাত অবধি থাকেন, ড্রিঙ্ক এর মাত্রাটাও বাড়তিই ছিল। ক্লাব বন্ধ হওয়ার মুখে ওঠেন, হাতে ইশারায় আমাকে ডেকে বলেন, 'ইট্‌স্‌ টুউ

লেট, আই হ্যাভনান উইথ মি, ইভ্ন মাই শফার হ্যাজ্নট কাম। আ এ্যাম্ ওয়েটিং ফর য়ু অন দ্য রোড, কাম উইথ মি।'
রিকোয়েস্ট নয় অর্ডার। আমার অবস্থা বোঝো, এমনটা যে ঘটতে পারে, তা ভাবা কি সম্ভব? ম্যাডাম সম্বন্ধে অন্য অনেক রকম কথা ভেবেছি কিন্তু স্বপ্নেও এ কথা ভাবিনি। কী ভাবছো, আমি কী করলাম। কী আর করব; ফ্লাই - ওভারের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়িতে উঠে চোরের মত চুপিচুপি। ম্যাডাম নিজেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যায় --- বিশাল বাড়ি, সামনে লন। গাড়ির শব্দে গেট খুলে যায়, ফটফট আলো জ্বলে ওঠে। 'ফলো মি' বলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকেন। বোঝো, আমার অবস্থাটা বোঝো একবার এর থেকে গুলি করে মেরে ফেলাও ভাল। কীবলব রে ভাই, কী সেই ঘরদোর, কী সেই আসবাব পত্র। যে আমি বড়লোকদের ক্লাবে থাকি, বড়লোকদের আদর কায়দা জানি, সেই আমারই চোখ ছানাবড়া। ঘরের আসবাব পত্রের একটারও নাম জানি না, এতকিছু থাকে মানুষের ভোগের জন্যে?
ম্যাডাম তখনও অর্ডার চালিয়ে যাচ্ছেন, বি ফিটেড।
আমি না বসেই বলি, 'অমায় ছেড়ে দিন, আমি এখন বাড়ি যাবো।'
ম্যাডামের অবস্থা, এ সময়ের অবস্থা বলে বোঝাবার নয়। ভূত দেখার মতো আঁৎকে উঠেন, 'আঁ, মিস্টার কাই । বাঙালী?'
ঃ হ্যাঁ আমি তো বাঙালীই।
ঃ বাট্, কিন্তু আমি তো ভেবেছিলাম আপনি চাইনিজ, মি.কাই। দেখতে তো একেবারে চাইনিজের মতই, এ হ্যাণ্ডসাম চাইনিজ ইয়ংম্যান।' হতাশা যে এতটা বদলে দিতে পারে মানুষকে নিজে না দেখলে বুঝতে পারতাম না। একেবারে ধপাশ করে বসে পড়েন তিনি। ভেঙ্গেপড়া স্বরে বলেন, 'ইওর ফার্স্ট নেম?'
'চঞ্চল কই।'
'ক--ই?' টেনেটেনে বলেন। ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে উঠে দাঁড়ান, ধীরে ধীরেই বলেন, না, আপনাকে আর আটকাবো না, যেতে পারবেন তো একা?' কিছুই বুঝতে পারি না। তবু মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে সিঁড়ি ভেঙ্গে নেমে আসি। বুঝতে অসুবিধা হয় না। বেঁচে গেছি, কারণ সেদিন আর হাজার টাকার নোট মেলেনি।
চঞ্চলের মুখ থেকে শোনা এই গল্পটা অনেকে বিশ্বাস করতে চাইবেন না, জানি। আমার নিজের কথা তো বলেইছি, আমার বল্যের সহপাঠী চঞ্চলকে আমি বিশ্বাস করি।
দু নম্বর গল্পটায় কোনো জটিলতা নেই। বিশ্বাস করবার ক্ষেত্রেও খুব যে অসুবিধা থাকবে না এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়। গল্পটা আমাদের জীবনচক্রের চৌহদ্দির মধ্যে এবং আকছার এ সব গল্প শোনা যায়, শোনা যায় কিন্তু ঘটনার বিয়োগান্ত পরিণতি সচরাচর আমাদের স্পর্শ করতে চায় না। অথচ ক্ল্যাসিক্যাল ট্রাজেডি লেখার কেউ থাকলে এর অন্তর্নিহিত বীজকে ট্রাজেডির মহীহ করতে অসুবিধা হতো না।
এ গল্পটা বলেছে আমার আর এক বন্ধু শুভেন্দু। এখন সাংবাদিক হিসেবে বেশ নাম করেছে। তার মুখেই শোনা যাক গল্পটা।
রাধ্যেশ্যামবাবু সামান্য ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যাদের বলে তাদের একজন। নুন আনতে পান্তা ফুরোবার অবস্থা না হলেও খুব স্বস্তিতে দিন কাটে না তার। দুই ছেলে এক মেয়ে নিয়ে কষ্টে সৃষ্টে দিন চলে যায়। সন্তানদের মধ্যে মেয়ে মালতীই বড়, ওরা থাকেন সুভাষগ্রাম অর্থাৎ আগেকার দিনের কোদালিয়া ছাড়িয়ে একটু দক্ষিণের একটা গ্রাম্য পরিবেশের নিজস্ব বাড়িতে। রাধেশ্যামবাবুর দোকান রাজপুর সোনারপুর মিউনিসিপ্যাল এলাকায়। ছেলে দুটি স্কুলে পড়ে, মেয়ে মালতী হয়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে গড়িয়া কলেজে ভর্তি হয়েছে। মালতীর মাথা ভাল, রেজাল্টও ভালই করেছে।
এসব তথ্য আমাকে যোগাড় করতে হয়েছে। ঘটনার পেছনের তথ্য ঠিকঠাক যোগাড় করতে না পারলে ঠিকঠাক সংবাদ লেখা যায় না। যারা লিখতে পারেন তাদের প্রণাম জানিয়ে বলি, তোমাদের জন্যই এ পেশার এত দুর্নাম, গল্প লেখায় কোনো কেরামতি লাগেনা, সংবাদ লেখার সময় নানাদিক নজর রাখতে হয়, সজাগ থাকতে হয়। তথ্য বিভ্রান্তি বা বিচ্যুতি ঘটলে তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া ভয়ানক হতে পারে। সাংবাদিকরা গল্প না বানিয়ে একটু কষ্ট করে সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারেন।
আমি যেদিন সুভাষগ্রাম স্টেশনে নেমে রিক্সা নিয়ে রাধেশ্যাম নস্করের বাড়ি যাই সেদিন সারাদিনই টিপটিপ বৃষ্টি পড়েছে। ভাঙ্গাচোরা রাস্তায় জল, আর জলের মধ্যে রিক্স চালানো অসম্ভব হচ্ছিল। আমার উপায় ছিলনা ভিজে ভিজে যাওয়ার,

তাছাড়া সঙ্গে ছিল ক্যামেরাম্যান চম্পক। আমরা দু'জনেই যখন আধভেজা হয়ে রাধেশ্যামদের বাড়ি পৌঁছই তখন বেলা দুপুর। সারা বাড়ি নীরব নিস্তব্ধ, হাপাট ঘর, দাওয়ার একপাশে কয়েকটা মুরগী পালকের মধ্যে মুখগুঁজে বসে আছে, ভেজা পালকে জলের ছাঁট প্রাণীগুলিকে ছোটকরে দিয়েছে। দাওয়ার কাছে দাঁড়িয়ে খোলা দরজা লক্ষ করে বললাম, আমরা খবরের কাগজের লোক, একটু বাইরে আসবেন?

আমাদের কথা শেষ হতে না হতেই ঘরের ভেতর থেকে অকস্মাৎ ডুকরে ওঠার শব্দ, কান্নার উৎসার ভেসে আসে। কাঁদছেন কোনো নারী। আন্দাজ করে নেওয়া যায় মালতীর মাই কাঁদছেন। সেই কান্নার মধ্যেই এক মাঝবয়সী লোক দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। শূন্য দৃষ্টি, পরনে লুঙ্গি আর গেঞ্জি, অনির্দেশ সেই শূন্য দৃষ্টি নিয়েই বলেন, 'দাওয়ায় উঠে আসুন, বাইরে দাঁড়িয়ে ভিজছেন কেন।'

আমরা ওঁর কথামত দাওয়ায় উঠি, আন্দাজেই জিজ্ঞাস করি, 'রাধে -- শ্যামবাবু।'

'আমিই রাধেশ্যাম্। মালতীর বাবা।' বলে আর নিজেকে বেঁধে রাখতে পারেন না ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন।

'কথা খুঁজে না পেয়ে আমি শুভেন্দু গুপ্ত বলি, 'আমরা ওর কলেজে গেছলুম, সেখান থেকে আসছি।'

রাধ্যেশ্যামবাবু চোখ লাল হয়ে উঠেছে, জলে ভেজা সেই লাল চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে তিনি জানতে চান, 'কলেজের ওরা কী বলল?'

'ওরা সবাই খুব দুঃখ পেয়েছে, বন্ধুরা তো গুছিয়ে কথাই বলতে পারল না।'

'পারবে কী করে?' বিড়বিড় করেন রাধ্যেশ্যাম, 'ওরা কোনো জবাবই দিতে পারবে না'। তারপর দু'হাতে কপালের দু'দিকের রগ টিপে ধরে মাথা ঠোকার মত ভঙ্গীতে বলে, 'খুনী আমি, আমিই খুনী, কিন্তু ওর বন্ধুরাও দায় এড়াতে পারে না, লিখে দেবেন আমারএসব কথা?'

'কী হয়েছিল মালতীর যাতে এমনভাবে মরতে হলো তাকে? একটু বলবেন আমাদের?' ঘরের মধ্যে তখনও একটানা কান্না, মা কাঁদছেন তার মেয়েকে হারিয়ে, একটি বারের জন্যও আমাদের সামনে আসেন না, এ কান্না তার নিজের দুঃখেরই প্রকাশ।

রাধ্যেশ্যাম যা জানিয়েছিল তা এ রকম  মেয়েটা আমার লেখাপড়ায় খুবই ভাল ছিল। ইস্কুলের দিদিমণিরা খুব সুখ্যাত করত, ওকে ভালও বাসত সবাই। যতদিন ইস্কুলে ছিল ততদিন মেয়ের কোনো আবদার ছিল না। যতদূর পেরেছি ওদের মানুষ করার চেষ্টা চালিয়েছি। মাস্টার রাখা, বই কেনা কোনো কিছুতেই ঘাটতি রাখতে চাইনি। শহরে গিয়ে কলেজে ভর্তি হবার পরেই ক্যাচালের শু। বন্ধু বান্ধবরা সবাই আমাদের স্ট্যাণ্ডার্ড না, পয়সাওলা ঘরের ছেলে মেয়ে বেশি। মেয়ে আমার ওই আবহাওয়ায় পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। একদিন এসে বলে, 'বাবা, একটা মোবাইল ফোন কিনে দেবে?'

আমি বলেছিলুম, 'দাম তো অনেক শুনেছি।'

'ও' বলে মেয়ে আমার দ্বিতীয় কথাটি না চলে গেল

আর একদিন মুখ তালি করে কলেজ থেকে ফিরল, শুকনো মুখ। দেখুন ছেলে মেয়েদের মুখ দেখেই মা - বাবা টের পায় দিনটা আনন্দের না দুঃখের। আমরাও বুঝতে পারি কলেজে নির্ঘাৎ কিছু একটা হয়েছে। 'হাতমুখ ধুয়ে পোশাক বদলে এলে পড়ে মালতীকে আমিই জিজ্ঞেস করি, 'কী হয়েছে রে মা?'

'না, কিছু হয়নি তো।'

'তা - লে, মুখ শুকনো কেন? লুকোচ্ছিস কিছু?'

মায়ের কথাশুনে মেয়ের চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে নামে। মুখে কিছু বলে না, তবে ও যে স্বস্তিতে নেই এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না আমাদের।

'কেউ কিছু বলেছে?'

এবার মেয়ে আর চুপ থাকতে পারে না, 'সববার মোবাইল আছে, আমার কেমন লাগে বল তো?'

ওর মা বোঝাতে চায়, 'অতগুলি টাকা বাবার হাতে নেই এখন। একটু সবুর কর, বাজারও তো মন্দা, সবুর করেইবা কী করবি।'

আমি ঠিক করেছিলাম একটু একটু করে জমিয়ে মেয়ের সাধ - পূরণ করব। তবে এই একটু একটুটা যে কবে শেষ হবে তা

আমিও জানিনা ভগাও জানে না।
এরকম দুঃখে বেদনায় চলছিল। মেয়ে কলেজে গেলেই কেমন হয়ে যায়, বাড়ি ফিরলে বোঝা যায় বন্ধুদের সঙ্গে সমান ত
ালে চলতে না পারার গ্লানিতে ভুগছে। কী করবো আমার হাতে তো সমাধানের উপায় নেই। চুপ করেই থাকতে হয়। এই
সেদিন, কবে ঘটল ব্যাপারটা --কবে? পরশুই না? পরশুই তো কলেজ থেকে ফিরে বললে, 'আমি আর কলেজে যাবো ন
া।'
আমি বললুম, 'কেন, কলেজে না যাবার কী হয়েছে?'
ও বলল, 'কী হয়েছে তাতো বললেও বুঝতে চাওনা।'
আমিও রেগেই গিয়েছিলাম, 'সামান্য কারণে - তুমি পড়াশোনা ছাড়বে তা হবে না। আর তোমার শখ মেটাতে আমিও মে
াবাইল দিতে পারব না।'
এই পর্যন্ত, এবং বেশি কিছু না। রাতেই সববনাশ করে দিয়ে মালতী চলে গেল, নিজের ওড়নার ফাঁস গলায় পরে ঝুলে
পড়ল ওই বাঁশের আড়া থেকে।
উদ্‌ভ্রান্ত রাধেশ্যাম ছুটে গিয়ে ওই শূন্য বাঁশের আগায় আঙুল তুলে উন্মাদের মত চেঁচাতে থাকল, আমি, আমিই খুনী।
কে যে খুনী তার জবাব খোঁজার কাজ আমার নয়। ক্যামেরাম্যান মালতীর মার ছবি নিতে পারেনি। এক লহমার জন্যই
তিনি মুখ তোলেননি। শ্যামাপদ যখন বাঁশের আড়া দেখিয়ে উন্মাদ নৃত্য করছে তখন ইশারা করি ওই ছবিই তোলার।
ছবিটা কাগজে খাবে ভাল, শূন্য বাঁশের আড়ার সামনে বাপের বিলাপ মন্দ হবে কি?
এ গল্পটার মধ্যে বিশ্বাস না করার উপাদান বোধ হয় নেই। খুবই চেনা, জানা আর ট্র্যাজিক এর চরিত্রগুলিও।
তিন নম্বর গল্পটি আমায় যে বলেছিল তার সঙ্গে এক অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল। উত্তীর্ণ সন্ধ্যায়, আ
মি অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। যে রাস্তা দিয়ে আমাকে যাতায়াত করতে হয় সে পথের দু'পাশে ফুটপাথ দখল করে
কয়েকটা পরিবার দিন গুজরান করে। এদের অনেকে মুখচেনা, বেশির ভাগেরই বৃত্তি ভিক্ষা, কেউ কেউ এটা - ওটা জন
খেটে রোজগার করে। মুখের ভাষা যদি পরিচয়বাহী হয় তো এরা সবাইই বাঙালী, হিন্দু - মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই অ
াছে।
সেউ উত্তীর্ণ - সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার মুখে হঠাৎ আমার পেছন থেকে কে যেন ডাকে। চেয়ে দেখি ওই ফুটপাতেরই বাসিন্দা
বছর তেরো - চোদ্দ বয়সের একটি ছেলে। ছেলেটি কাছে এসে অত্যন্ত সপ্রতিভ স্বরে জিজ্ঞাসা করে, 'হ্যাঁগো, তুমি মুসলম
ান না বাঙালী?' ওর মুখ এতই সারল্যে ভরা যে ওকে আমি দুঃখ দিতে পারলাম না। উত্তর না দিয়ে হ্যাট হ্যাট করে চলে
যেতে পারতাম, তাতে নির্ঘাৎ ও দুঃখ পাবে বুঝে থেমে দাঁড়িয়ে ওর কথার উত্তরে বলি, 'আমি বাঙালীও মুসলমানও।'
অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকায়। অনেক বিদ্বান - ধনবান যখন এই একই প্রশ্ন করে থাকেন তখন এ ছেলের আর
দোষ কী? ওতো সমাজেরই প্রোডাক্ট। আমার উত্তর ওর পছন্দ হয় কীনা জানি না।, আমার ওকে পছন্দ হয়ে যায়। ওর
সরলতা আর অজ্ঞতা আর দারিদ্র্য আর স্বাস্থ্যহীনতা আমার কানে কানে এ বাংলার যে কাহিনীর কথা বলে তা প্রায়শই
আমার মনকে দ্রব করে।
তাই একদিন একে ধরে নিয়ে চায়ের দোকানে বসি। ব্যাটাছেলে কিছুতেই বাবুর সঙ্গে বসে চা - পাঁউটি খেতে চায় না, আ
মিও নাছোড়। ফলে এক সময় রফা হয়ে যায়।
ওর নাম নীলমণি, মা - বাবা ডাকত নীলু বলে। ক্যানিং টাউন ছাড়িয়ে মাতলা নদী, সেই নদীর ওপারে ওদের বাড়ি ছিল,
ছিল এখন আর ঠিক মনে রাখতে পারে না। একটা কথাই শুধু মনে আছে, ওর নাম নীলমণি, মা - বাবা নীল বলে ডাকত।
সেই নীলু আমাকে তিন নম্বর গল্পটা বলেছে। বিশ্বাস - অবিশ্বাসের প্রশ্ন তোলা ঠিক না, কারণ নীলের জগৎটা আমরা দূর
থেকে দেখি, দেখি কখনওবা ডকুমেন্টারি, ছবিতে, পর্দায়। ফলে নীল যাযা বলেছে তাতা বিশ্বাস করতেই হবে।
নীলা বলেছে, আমার মা কেমন ছিল আমার মনে নাই। একটা কালো বুক ছিল। বুকে ঝুলতেছিল দুটো দুধ, আমি চকচক
শব্দ তুলে সেই দুধ খেতাম, আর কিছু মনে নাই।
একটা নদীর কথা ইট্টু ইট্টু মনে আছে। জল কীরে ভাই, ষাঁড়াষাঁড়ির বান শুনেছি, সেত বানে জলে ভেসে যেত। ধু-ধূ জল।
ধু - ধু - জল ছাড়া আর কিছু মনে নেইগো আমার। তোমরা অত জল দেখোনি, আমি যা জল দেখেছি। আমার মা - বাবা

দু'জনেই সারাদিন খাটত। আমি ঘরে বসে কানতাম--- মনে আছে, আর কিছু মনে নাই।
একদিন, মনে আছে বটে, সেদিনটা মনে আছে। মা মীন ধরতে নদীতে যেত, অনেকে একসঙ্গে মীন ধরত। মীন ধরা কাকে বলে জানো না? আমিও জানিনা, কথাটা জানি, আমার মা মীন ধরত, শুনেছি। আর কী শুনেছি জানো? একদিন মীন ধরতে ধরতে মা আমার নদীর অনেক দূরে চলে যায়। আর কুমীর জানোতো, মেছো কুমীর মাও মীন ধরচে কুমীরও মাছ খাবে -- এমন করতে করতে কুমীর মাকে ধরেই এক ডুব। আমার মাকে, বোঝো যার কথা আমার মনেই নেই আর। ওদের মুখে শুনিছি নদীর জল খুব লাল হয়েছিল, মা কালো কালো দুটো হাত তুলে কাকে যেন খুঁজতেছিল। সবাই বলেছে, নীলু তোরেই খুঁজতেছিল মা। এই তো আমার মনে আছে।
মার কথা তো শুনলে। মীন তুলতে তুলতে কুমীরের পেটে যাওয়ায় তাও আমার মনে আছে কথাগুলো। বাপের কথা জিগুবে না, এট্টু কিছু মনে নেই। আমার হাত ধরে নিবারণ কাকা কলকাতা নিয়ে এসেছে। দেশে থাকলে তো না খেয়ে মরতাম, কলকাতায় এলে নাকি না খেয়ে মরে না কেউ। বল, ঠিক না ? কত লোকে কতকিছু খায় এখানে।
তোমারে আমি ভালবাসি বলে আর একটা কথা বলি, কারোরে বলবে না। পেথম যে ফুটপাতে ডেরা বেঁধেছিলাম সেখানে আমার একটা বন্ধু হয়েছেল। আমরা দু'জনে তো সমান দুঃখী, বন্ধুও হয়েছি তাই। ওর কোনো নাম ছিল না, আমার তবু বাপমায়ের দেওয়া একটা নাম আছে ওর তাও ছিল না। ছিল একটা কুকুর, কুকুরটার কিন্তু নাম ছিল, কেলো। ও কেলোকেও খুব ভালবাসত, রাতে জড়িয়ে ঘুমোতে। এক রাতে হলো কী, কারোকে বলবে না কিন্তু, ওরা --- আমার বন্ধুটা আর কেলো জড়াজড়ি করে ঘুমিয়ে আছে গড়াতে গড়াতে রাস্তার পাশে চলে গিয়েছিল। কেলোর কেউ কেউ শুনে আমার ঘুম চটকে যায়। দেখি একটা গাড়ি কেলো আর ওকে চাপা দিয়ে চলে গেল। কেলো তবু কেঁউ কেঁউ করতে পেরেছে বন্ধুটা তাও পারেনি।



সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com